এখানে আঁধার - ১

পর পর দু'টো ক্লাস নিয়ে গলাটা শুকিয়ে এসেছিল শ্রাবন্তীর। স্টাফরুমে ঢুকে আগে চায়ের ফরমাস করলো। স্টাফরুমটা প্রকাণ্ড বড় হলঘর। তারই একপাশে গাবি-তে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে একটা বুড়ি হিটারে চা বানায়। অবশ্য সত্যিই বুড়ি কিনা হলফ করে বলতে পারবে না শ্রাবন্তী। ঘোমটা টানা মুখ আর সরু এক জোড়া পা ছাড়া স্ত্রীলোকটির শরীরের আর কোন অংশ এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর হয়নি তার। বলিরেখাময় মুখখানায় বয়সের ছাপ, নাকি জীবনের নানা ঝড় ঝঞ্ঝার চিহ্ন বলা শক্ত।

তবে আর যাই হোক ভারি চটপটে কর্মক্ষম মানুষটা। ফরমাস করার অল্পক্ষণের মধ্যেই চায়ের কাপ মুখের গোড়ায় হাজির। ইথিওপিয়ান টিচাররা দুধ ছাড়া চা খায়, চায়ে চিনির পরিমাণ খুব বেশী। শ্রাবন্তীর চায়ে দুধ দিতে এবং ঠিক মাপা এক চামচ চিনি দিতে কোনদিন ভুল করে না। শ্রাবন্তীর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় স্ত্রীলোকটির নাম জিজ্ঞেস করে কিন্তু অন্যান্য টিচাররা কেউ ওকে নাম ধরে ডাকে না। কে জানে সেটা নিয়ম বহির্ভূত হবে কিনা এই ভেবে আর এগোয়নি শ্রাবন্তী। তবে স্ত্রীলোকটির হাতের চা রোজই দু'একবার প্রয়োজন পড়ে তার। অন্য টিচাররা - ইথিওপিয়ান এবং ভারতীয় ছোকরা বয়সের যারা - তাদের পছন্দ স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানটা। অবশ্য শুধু চায়ের দোকান বললে ভুল বলা হবে। চা, কফি, ডিমসিদ্ধ, ডাবো (পাউরুটি) সবই পাওয়া যায় সেখানে। এ ছাড়া একটা বিলিয়ার্ড রুমও আছে। তবে দোকানটার নাম "ন্যাশনাল বার" কেন সেটা এখনও জানে না শ্রাবন্তী। কোন মাদক দ্রব্য ওখানে বিক্রী হতে দেখেনি কোনদিন। তবু সচরাচর ওখানে যাওয়াটা এড়িয়ে যায় সে। নামের কারণেই কি? তা হয়তো নয়, তবে স্টাফরুমের চায়েই তার প্রয়োজন মিটে যায় যখন অতখানি হেঁটে গিয়ে চা খাওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না সে। অবশ্য মাঝে-মধ্যে এক আধ বার যেতেই হয়। সহকর্মীরা দল বেঁধে চা খেতে যাবার সময় শ্রাবন্তীকেও ডাকে এবং যেদিন পরের পিরিয়ডটা খালি থাকে সেদিন আর আপত্তি করে না সে।

আজও পর পর দু'টো পিরিয়ড খালি আছে তার। শ্রাবন্তী ভেবে রেখেছিল

ক্লাশ টুয়েলভের প্রশ্নপত্র খানিকটা তৈরী করে ফেলবে আজ। খাতাপত্তর খুলে নিয়ে কাজ শুরু করতে যাবে এমন সময় একটা ছোকরা মতন লোক এসে একটা কাগজ সামনে ধরলো। ছোকরাটি ইথিওপিয়ান, ইংরিজী বলতে বা বুঝতে পারে না। ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখে বাংলায় লেখা চিঠি। শ্রাবন্তীর উদ্দেশে কোন এক সমরেশ মজুমদার লিখেছেন। লিখেছেন তিনি দু'দিনের জন্যে ডেসিতে এসেছিলেন, আজ বিকেলে আদিস আবাবা'য় ফিরে যাবেন। গতকাল স্কুলের স্টাফরুমে এসে শ্রাবন্তীর খোঁজ করে তাকে পাননি। শ্রাবন্তী যদি ন্যাশনাল বার'এ এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করে তবে ভাল হয়। ওঁর স্ত্রী ওঁকে অতি অবশ্য করে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে ----।

সমরেশ মজুমদারের স্ত্রী কেন কি কারণে তাঁকে শ্রাবন্তীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে ভেবে পেলো না শ্রাবন্তী। তবু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। পত্রবাহককে ইশারায় বললো, চলো যাওয়া যাক। ছোকরাটি হেসে মাথা হেলালো। তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলো ও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্রাবন্তীর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

ডেসি শহরটা পাহাড়তলিতে। খুব খাড়া চড়াই উৎরাই না হলেও ঢাল বেয়ে ওঠা নামা করতে হয় প্রায়ই। স্কুলের গেট থেকে অনেকখানি নীচে নেমে রাস্তা। রাস্তার মুখেই ন্যাশনাল বার। ইথিওপিয়ান ছেলেটিকে দেখতে না পেয়ে একাই দোকানে ঢুকলো শ্রাবন্তী, খদ্দেরের ভিড়ে সমরেশ মজুমদারকে খুঁজে বার করার প্রয়াসে। পাশের টেবিল থেকে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন। শ্রাবন্তী ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক শ্রাবন্তীর জন্যে একটা চেয়ার টানার উপক্রম করছিলেন, শ্রাবন্তী অন্য একটা চেয়ার এগিয়ে নিয়ে বসলো।

তারপর বললো, "কি ব্যাপার বলুন তো?"

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে আদ্যোপান্ত জানালেন সব। ইথিওপিয়ার বাঙালীরা খুব ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠি। সবাই সবার খোঁজ খবর রাখে, মাঝে মধ্যেই গেট-টুগেদার'- এ একত্র হয় সবাই। শ্রাবন্তী যে এদেশে এসেছে ঘুণাক্ষরেও জানতো না কেউ। মাত্র ক'দিন আগে আরিফের কাছে শুনলো। আরিফ নাকি ম্যাডামের খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছিল অতি অল্প সময়েই। আরিফ আদিসে বদলি হয়ে চলে যাবে শুনে অবধি ম্যাডাম মনমরা হয়ে ছিলেন। আরিফকে বড় হোটেলে বিরাট এক বিদায় সম্বর্দ্ধনা দিলেন, ডেসির সমস্ত ভারতীয় শিক্ষকরা আমন্ত্রিত হয়েছিল

সেখানে। ম্যাডাম তো কেঁদেই ফেললেন ----।"

শ্রাবন্তী একটু অধৈর্য হয়ে বললো, "আমি তো ওদের কাউকেই চিনি না। কে এই আরিফ? ম্যাডামটিই বা কে?"

সমরেশ মজুমদার একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আরিফ রহমানকে আপনি চেনেন না? আপনাদের স্কুলে হিস্ট্রির টিচার ছিল। গতমাসে আদিসে চলে গেল ট্রান্সফার নিয়ে। সে-ই আপনার কথা বলেছে। আমার গিন্নি তো শুনে মহা আপসেট। বললো, 'একজন বাঙালী মহিলা ডেসিতে একা পড়ে রয়েছে সহায়হীন বন্ধুহীন অবস্থায়। তুমি ডেসিতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে বলবে আমরা আছি ওর পাশে। ছুটিছাটায় আদিসে এসে আমাদের কাছে ক'দিন কাটিয়ে যাবে যখন খুশি।'"

শ্রাবন্তী দু'হাতে মাথার রগ দু'টো চেপে ধরলো।

অস্ফুট স্বরে বললো, "ও মাই গড!" তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলো, "আপনি শুধু এই জন্যে ডেসিতে এসেছেন? অন এ রেসকিউ মিশন?"

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, "না, ঠিক তা নয়। ডেসিতে ইউ.এন.ডি.পি'র কয়েকটা প্রোজেক্ট চালু হবে যা আমাদের আওতায় পড়ে। মাসে দু'একবার সেই সূত্রে আসতে হয়।"

শ্রাবন্তী বললো, "আমি মাস তিনেক হল এসেছি। বেশ ভালই লাগছে জায়গাটা। আসলে আমরা দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস ফ্যামিলি। আমার স্বামী ভারতীয় বিমান বাহিনীতে কাজ করেন। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, তবে ইচ্ছামত কোথাও যাবার স্বাধীনতা তাঁর নেই। আমার সেটা আছে। কাগজে যখন দেখলাম ইথিওপিয়ায় ইংলিশ টিচার চাই, আমরা ঠিক করলাম সুযোগটা লুফে নেওয়া উচিৎ। আমার ছেলেমেয়েদের উৎসাহেই আসতে হল। তবে কন্ট্র্যাক্টের পুরো তিনটে বছর বোধহয় এদেশে থাকা হবে না। তিন মাসেই বেশ হোমসিক হয়ে পড়েছি।"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "এর পরের পিরিয়ডে ক্লাস আছে, চলি।"

ভদ্রলোক বললেন, "এক মিনিট।" চেয়ারের পাশে রাখা কালো এয়ার ব্যাগ খুলে একটা প্যাকেট বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। "খাস দেরাদুনের বাসমতী চাল। আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে। প্লীজ, না বলবেন না।"

শ্রাবন্তীর মাথাটা দপ দপ করতে লাগলো কি এক অপ্রীতিকর অনুভূতিতে।

তবু কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম রেখে বললো, "ঠিক কথা। ইথিওপিয়াতে সবাই তো খাদ্যদ্রব্যই পাঠায় সারা পৃথিবী থেকে।"

তারপর হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা স্কাই-ব্লু রঙের ফাউন্টেনপেন বার করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "আমার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাসহ আপনার স্ত্রীকে এই সামান্য উপহারটা দেবেন। আসি তা হলে।"

শ্রাবন্তী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো।

সমরেশ মজুমদারও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ছুটিছাটায় চলে আসবেন আদিসে। আমরা থাকি আরাৎ কিলোয়, যে কোনও ট্যাক্সিওলা নিয়ে যাবে আপনাকে ----।"

শ্রাবন্তী বললো, "সেটা বোধহয় হয়ে উঠবে না। আসার সময় বাসের ঝাঁকানিতে যা দুরবস্থা হয়েছিল! দেশে ফেরার সময় শুধু আদিস যাবো, তার আগে নয়। তবু আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ।"

শ্রাবন্তী কোনদিকে না তাকিয়ে ন্যাশনাল বার থেকে বেরিয়ে এলো। গট গট করে স্কুলের পথ ধরলো। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে স্কুলের গেট। অন্যদিন সাবধানে রাস্তা দেখে ওঠে এ পথে। আজ সারা মন-মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার। হাতের প্যাকেটটা আরও যেন বিরক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দূর বিদেশে খাস দেরাদুনের চাল কোন কাজে লাগবে তার? বাড়িতে নিজে রান্না করতো শ্রাবন্তী। ছেলে মেয়ে স্বামী খাবার টেবিলে তার হাতের রান্না তৃপ্তি করে খেতো আর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠতো তার মন। এখানে রান্নার ধারে কাছে যেতে মন চায় না। জুরেইশ নামের একটি ইথিওপিয়ান কিশোরী মেয়ে ওর বাড়ির কাজকর্ম করে। সে-ই আটা মেখে পরোটা বেলে ঢাকা দিয়ে রেখে যায়, ওমলেটের জন্যে ডিম গুলে পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি সব রেডী করে রাখে। দু'বেলাই। খাবার আগে স্টোভে পরোটা আর ওমলেট ভেজে নেয় শ্রাবন্তী। কিছু ফল-মূল রাখে বাড়িতে, মুসুম্বি, কলা, এটা সেটা। শাক সবজির ঝঞ্ঝাট পোয়াতে ইচ্ছে করে না। এ ছাড়া বড় টিনে নিডোর গুঁড়ো দুধ মজুত থাকে, লাউয়ের মত লম্বা আকৃতির রুটি বা "ডাবো" আনিয়ে রাখে। একটা মানুষের খাওয়ার জন্যে এর বেশী হাঙ্গামা পোষায় না। বিশেষ করে দেশ দেখতে আসাটাই প্রধান উদ্দেশ্য যেখানে।

আজ মঙ্গলবার। সারা সন্ধ্যা সারা রাত বিজলি বন্ধ। সোম - বুধ - আর শুক্কুর, সপ্তাহে এই তিন দিন বিজলি থাকে, বাকী দিনগুলো হারিকেন লণ্ঠনের টিমটিমে আলোই ভরসা। অভ্যাস হয়ে গেছে শ্রাবন্তীর। লেখাপড়ার যাবতীয় কাজ ওই সোম - বুধ - শুক্কুরবারে সেরে রাখে। অন্য দিনগুলো তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ট্রান্সিস্টারে

বি.বি.সি.'র প্রোগ্রাম শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

আগে থেকে জানা আছে সবার, কোন দিন তাদের এলাকায় বিজলি থাকবে, কোন দিন থাকবে না। সামাজিক, সরকারী, ব্যক্তিগত যা কিছু অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম, আগে ভাগে এই তথ্যটা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করে লোকে। তারপর একেবারে নির্ভাবনায় থাকে এ ব্যাপারে। আমাদের দেশের মত যখন তখন বিনা নোটিসে হুট হাট করে আলো নিভে গিয়ে লোকের সুব্যবস্থিত আয়োজন ভণ্ডুল করে দেয় না। খুব ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে আছে শ্রাবন্তীর। দুর্গাপুজোয় সন্ধ্যেবেলা থিয়েটার দেখতে গেছে। রামায়ণের গল্প। তরণী সেনকে লক্ষ্য করে মৃত্যুবাণ ছুঁড়েছে রাম। তরণী সেন ভূতলে পড়ার আগেই দপ করে সবকটা বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে ন যযৌ ন স্তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তরণী সেন। মরেছে কি মরেনি ঠিক করতে পারছে না, প্রম্প্টার পর্দার আড়াল থেকে যেমন নির্দেশ দেবে সেইমত হবে। পুরো সিনটা আবার করে করতে হল বাতী আসার পর। সে তুলনায় এখানকার নিয়মটা অনেক সহজ সরল জটিলতাবিহীন।

তার আজ শশাঙ্ককে একটা চিঠি লিখতেই হবে। গতকালের চিঠিটা স্কুলে যাবার সময় পোস্ট করেছে। আবার আগামীকাল চিঠি লেখার কথা। ওর সারাটা দিনের খুটিনাটি জানিয়ে একদিন অন্তর চিঠি লেখে স্বামীকে। শশাঙ্ক প্রায় প্রতিদিনই চিঠি লেখে। কিন্তু চিঠিগুলো শ্রাবন্তীর কাছে পৌঁছয় একসঙ্গে, পাঁচদিন অন্তর। আদিস থেকে পাঁচদিনের মেল নিয়ে ডাকগাড়ি ডেসিতে আসে যেদিন। ডেসি থেকে আদিসেও নিশ্চয়ই পাঁচদিন অন্তর ডাকগাড়ি যায়। কিন্তু শ্রাবন্তীর মন মানে না। শনি-রবি দিনের বেলা চিঠি লেখে আর যে তিন দিন আলো থাকে স্কুল থেকে ফিরে চট্‌পট্ সব কাজ সেরে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ে।

সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে মন মেজাজ ভাল নেই শ্রাবন্তীর। ভদ্রলোকের হয়তো কোন দোষ নেই, স্ত্রীর ইচ্ছাতেই এসেছেন তাঁর শুভেচ্ছা ও উপহার বহন করে। কিন্তু আদিসের বাঙালী মহলে তার ভাবমূর্তির কথাটা ভুলতে পারছে না শ্রাবন্তী। ছিঃ! সদ্য আগত এক মহিলা তার সহকর্মী অন্য শহরে চলে যাচ্ছে বলে কেঁদে ভাসাচ্ছে। কথাটা যতক্ষণ না শশাঙ্ককে জানাচ্ছে, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে শশাঙ্কর মন্তব্য শুনছে শান্তি পাবে না শ্রাবন্তী। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে শশাঙ্কর দায় পুরো মাত্রায়। তার পরামর্শ মতই হোটেল আমবেসেলে অমন উচ্চমানের ঢালাও পার্টি দিয়েছিল শ্রাবন্তী। আরিফ রহমানের

সঙ্গে শ্রাবন্তীর পরিচয়-সূত্র খুব ক্ষীণ, অন্য শিফ্‌টে পড়ায় কাজেই দেখা সাক্ষাৎও ক্কচিত কদাচিৎ হত। আর ডেসিতে পদার্পণ করার প্রথম সন্ধ্যা থেকেই লোকটাকে অপছন্দ করে শ্রাবন্তী। সামান্য একটা ঘটনা থেকেই মানুষটার মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছিল।

আদিসের শিক্ষাদপ্তর প্লেন-বোঝাই ভারতীয় টিচারদের ঝটপট বিভিন্ন এলাকায় বিলিবন্দেজ করে তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেললো। আটত্রিশ জন টিচারের মধ্যে তিনজন যাবে ওল্লো প্রদেশের রাজধানী ডেসিতে। এই তিনজন হল শ্রাবন্তী, ভিক্টর জন ও হবিবুল্লা। আট ঘণ্টা বাসে কাটিয়ে ডেসিতে যখন প্রবেশ করলো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। স্থানীয় শিক্ষা দপ্তর থেকে লোক পাঠিয়েছিল। বছর উনিশ-কুড়ির এক ছোকরা - শিফারো - জীপ নিয়ে মজুত ছিল বাস স্টেশনে। ওদের জীপে তুলে নিলো জিনিসপত্তর সমেত। বললো "অ্যাডাম পেন্‌সন্‌" হোটেলে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তবে এক্ষুণি সেখানে যাবে না তারা। এক ভারতীয় শিক্ষক বলে রেখেছে নবাগতদের তার বাড়িতে ডিনার খাইয়ে তবেই যেন শিফারো তাদের হোটেলে নিয়ে যায়। কথাটা শুনে তিনজনেই আশ্বস্ত বোধ করলো। নতুন জায়গায় এসে একেবারে জলে পড়েনি তারা, এখানেও তাদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবার
লোক আছে তাহলে!

সেদিন লোড-শেডিং'এর দিন। ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে ছোট্ট একটা আধুনিক ধাঁচের বাড়িতে গেল তারা। আরিফের সঙ্গে আর যে দু'জন টিচার থাকে তারা উইক-এণ্ডে আদিস গেছে। বছর দশেকের একটি ছেলে টেবিলের উপর খাবার এনে রাখলো। আরিফ রহমান বললো রান্নাবান্না ওই ছেলেটাই করেছে। ওর নাম মুলুগেতা। মুলুগেতার হাতের মাটন বিরিয়ানি খেলে নাকি ভোলা যায় না। বাটার চিকেন, ফিশ-ফ্রাই, মুর্গ মসল্লম এসব রান্নাতেও সিদ্ধহস্ত মুলুগেতা।

ডিনার বাই ক্যাণ্ডল-লাইট। টিমটিমে মোমবাতির আলোয় খেতে বসলো ওরা। মোট চারজন - অতিথি তিনজন আর গৃহকর্তা আরিফ রহমান। অতি সাদাসিধে মেনু - রুটি, আলুর ঝোল, আর পেঁয়াজ টমাটো কুচির সালাড। রহমান বললো ম্যাডামের কথা চিন্তা করেই সে সাদা শাকাহারী ভোজনের ব্যবস্থা করেছে, চিকেন-মাটন, বিরিয়ানি বাদ দিয়ে। শ্রাবন্তীর খুব খারাপ লাগছিল। ভিক্টর জন ও হবিবুল্লার মুখে সুস্পষ্ট নিরাশার ছাপ ওই স্বল্প আলোকেও পরিষ্কার

দেখতে পাচ্ছিলো সে।

শিফারো হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া কোন এক জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে হুড়মুড় করে জীপে চড়ে অন্তর্ধান করলো। বললো পরে এসে ওদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। শ্রাবন্তীর মনে হল ডিনারের বহর দেখেই তড়িঘড়ি কেটে পড়লো শিফারো। রুটি আলুর ঝোলে আপত্তি ছিল না শ্রাবন্তীর কিন্তু শুধু তারই কথা বিবেচনা করে রহমান এই সাদা-মাটা মেনু রাখতে বাধ্য হয়েছে বার বার সেই কথা শুনে রাগ হচ্ছিল। প্লেনে পাশের সিটের শাকাহারী সহযাত্রীর কথা চিন্তা করে না কেউ। যাত্রীরা ইচ্ছামত ভেজ বা নন-ভেজ খায় যার যা অভিরুচি। শ্রাবন্তী নিজেও শাকাহারী নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে রহমানকে এ তথ্য জানাতে রুচিতে বাধলো তার।

পরদিন ইথিওপিয়ার অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ ব্যাপারটাও আদ্যোপান্ত লিখলো শশাঙ্ককে।

ডেসিতে মোটামুটি ভালই লাগছিল শ্রাবন্তীর। সহজ সরল জীবনযাত্রা। স্কুলে কাজের চাপ নেই একেবারেই। যে ক'জন ইথিওপিয়ানের সংসর্গে এ-যাবৎ এসেছে সবাইকেই সহৃদয় অতিথিবৎসল বলে মনে হয়েছে তার।

ভারতীয় টিচাররা শহরের পশ্ এলাকা "কুতবাবেত"এ তিনজন চারজন করে বাড়ি শেয়ার করে থাকে। একমাত্র শ্রাবন্তীই ইথিওপিয়ান পল্লীতে মাটির বাড়িতে আছে। শুরুতে কর্তৃপক্ষ তাকেও কুতবা -বেত'এ একক একখানা ছোট ফ্ল্যাট অ্যালট করেছিল। কিন্তু কিছু ভারতীয় শিক্ষকের মধ্যস্থতায় পরে সেটা শ্রাবন্তীর বদলে এক বিবাহিত দম্পতিকে দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই শিক্ষক এই স্কুলেই। শ্রাবন্তী প্রতিবাদ করলে শিক্ষা দপ্তর তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাকে তক্ষুণি ইথিওপিয়ান পল্লীতে 'কাবেলে'র বাড়ি দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় এর পর পশ এলাকায় প্রথম যে ছোট বাড়ি খালি হবে সেটা শ্রাবন্তীই পাবে, অন্য কেউ নয়।

এ বাড়িটা মাটির হলেও খুব ছোট নয়। তিনটে মাঝারি সাইজের ঘর। প্রকাণ্ড বড় - প্রায় ফুটবল মাঠের সাইজের - বারোয়ারী কাঁচা উঠোন। উঠোনের মধ্যিখানে এক সারি ছোট সাইজের মেটে ঘর। প্রত্যেক বাড়ির জন্যে দু'টো ছোট ঘর বরাদ্দ - রান্নাঘর ও টয়লেট। শ্রাবন্তীর রান্নাঘর খালিই পড়ে আছে এ-যাবৎ।

তিনটে কামরার একটাতে একপাশে স্টোভে রান্না হয়। দু'বেলাই পরোটা ও ওমলেট, আর বার কয়েক কফি অথবা চা। আলাদা রান্নাঘরের কোনও প্রয়োজন অনুভব করেনি শ্রাবন্তী। তাছাড়া টয়লেটের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রান্নাঘরের ব্যবস্থাটাও কেমন বাধো বাধো লেগেছে তার। ইতিমধ্যে পশ্ আধুনিক পাড়ায় কয়েকবার বাড়ি খালি হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর শ্রাবন্তীকে জানিয়েছে সে কথা। কিন্তু শশাঙ্কর পরামর্শ মত শ্রাবন্তী প্রতিবারই সে বাড়ি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ইথিওপিয়ান পল্লীতে ঢের বেশী শান্তিতে আছে সে। তাছাড়া এই দেশটাকে ভালভাবে জানার জন্য এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হয় না।

ভারতীয় শিক্ষকরা ছুটির দিনে মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়িতে গেট টুগেদারের আয়োজন করতো। শ্রাবন্তীকেও ডাকতো তারা। এইভাবে বেশ কয়েকটা বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছে শ্রাবন্তী। কিন্তু তার বাড়িতে গেট টুগেদারের প্রশ্নই ওঠেনা। এদিকে একতরফা নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ানোটাও ভাল লাগে না শ্রাবন্তীর। শশাঙ্ক উপায় বাৎলালো। শহরে ভাল একখানা হোটেল যখন রয়েছে সেখানেই ভোজের ব্যবস্থা করতে পারে শ্রাবন্তী, বাড়তি ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে।

হোটেল আমবেসেলে শ্রাবন্তীর প্রথম পার্টিটা আরিফ রহমানের আদিস যাবার দু'দিন আগে পড়লো। মেনু-টেনু সব শশাঙ্কই বেছে দিয়েছিল সুদূর যোধপুরে বসে। ডেসির বাইশজন ভারতীয় শিক্ষকের প্রায় সকলেই এসেছিল পার্টিতে। আরিফ রহমানও এসেছিল। ডেসিতে পা দিয়ে প্রথম তার বাড়িতেই খেয়েছিল শ্রাবন্তী। সে কথা মনে ছিল তার। ওর সঙ্গে দু'একটা মামুলি কথাবার্তা হয়েছিল পার্টিতে। ভোজটা যে আরিফ রহমানের বিদায় সম্বর্ধনা বলে মনে হতে পারে, আকারে ইঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও কেউ এমন আভাস দেয়নি। শ্রাবন্তীর মনেও এরকম সম্ভাবনা উঁকি দেয়নি একবারও। আদিসে গিয়ে লোকটা এরকম উট্পটাঙ্ গুজব রটাবে জানলে কক্ষণো ডাকতো না তাকে।

- ২ -

সন্ধ্যে লাগার আগেই জুরেইশকে ছেড়ে দেয় শ্রাবন্তী। অনেকটা পথ হেঁটে বাড়িতে পৌঁছবে মেয়েটা। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে হায়েনার আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে মানুষজন বেশী দেখা যায় না। মায়েরা উঠোনের মেটে ঘরে দোর এঁটে রান্না বান্না করে। তারপর সন্তর্পণে বার বার

চারিদিকে দেখে নিয়ে জোরে পা চালিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ে খাবার-দাবার সমেত। শ্রাবন্তী সন্ধ্যের পর সাহস করে এক-আধবার উঠোনের দিকের দরজাটা খুব একরত্তি ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করেছে। উঠোনের মধ্যিখানে সারিসারি ঘরের মধ্যে ওর ঘর দু'টো একেবারে একপাশে। ঠিক ওর তিন কামরার বাড়িটার মতন। উঠোনে ছায়ার মত কারা যেন ঘুরে বেড়ায়। তারপর হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়। শ্রাবন্তী তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লাটা চেপে বন্ধ করে খিল তুলে দেয়।

"কুতবাবেত"এর হাল ফ্যাশানের বাড়িগুলোর বাসিন্দারা অধিকাংশই বিদেশী। কিন্তু এই কাবেলের মাটির বাড়িতে শ্রাবন্তীই একমাত্র বাইরের লোক। কাবেলের বাসিন্দারা সর্বদা নজর রাখে তার উপর বুঝতে পারে শ্রাবন্তী। কিন্তু তার খারাপ লাগে না। এ যেন অভিভাবকের নজর রাখা। এতদিন এদেরই ভরসায় নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে দিন কাটিয়ে এসেছে সে। কিন্তু ইদানীং তার নিশ্চিন্ততায় চিড় ধরেছে রাতের অন্ধকারে ওই ছায়ামূর্তির আনাগোনায়। শশাঙ্ককে লিখেছিল। শশাঙ্ক শ্রাবন্তীকে এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উদ্বেগ ভয়-ভাবনা করতে মানা করলো। হয়তো ওর ফালতু রান্নাঘরখানা অন্য কেউ কাজে লাগাচ্ছে - বাড়তি অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখছে মাঝে মাঝে। কিংবা হয়তো গোপন অভিসারের লীলাক্ষেত্র হিসেবে লয়লা-মজনুরা ব্যবহার করছে ঘরখানা এবং শ্রাবন্তী প্রকারান্তে তাদের আশীর্বাদ কুড়িয়ে পূণ্য সঞ্চয় করছে।

সোমবার পর পর দু'টো ক্লাস নিয়ে ফ্রি পিরিয়ডে স্টাফরুমে বসে চা খাচ্ছিল শ্রাবন্তী। মিঃ মেনন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের সব সময় একটা ব্যস্তসমস্ত ভাবভঙ্গী। নোটিস বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার হন্তদন্ত হয়ে দরজা দিয়ে বেরুবার মুখে ঘরের ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে শ্রাবন্তীকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন। তারপর দ্রুতপায়ে ওর কাছে এলেন।

"আমার স্ত্রী বলে পাঠিয়েছে স্কুলের পর আপনি আমাদের বাড়ি চলে আসবেন। আপনার ফেভারিট কাঁঠাল বিচির সাম্বার রান্না হয়েছে আজ।"

মিসেস মেনন মাঝে মাঝেই শ্রাবন্তীকে বাড়িতে ডেকে খাওয়ান। মুহূর্তে শ্রাবন্তীর মনটা প্রসন্নতায় ভরে গেল। মিসেস মেনন চমৎকার মহিলা। তাছাড়া সমরেশ মজুমদারের দান সেই বাসমতী চালের একটা হিল্লে হবে। মেনন পরিবারে ভাতের ভক্ত সবাই। প্যাকেটটা ওদেরই দেওয়া যায়।

পাঁচ দিন অন্তর শশাঙ্কর একগুচ্ছ চিঠি আসে। ফ্রি পিরিয়ডে স্টাফরুমে বসে রুদ্ধশ্বাসে সবক'টা চিঠি পড়ে ফেলে শ্রাবন্তী। তারপর বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই চিঠিগুলো সামনে মেলে ধরে। এরপর আরও বহুবার পড়ে প্রতিটি চিঠি, পড়ে মুখস্ত করে ফেলে। সারাদিনের কাজের এবং অবসরের মাঝে বার বার চিঠির কথাগুলো মনে পড়ে। শ্রাবন্তীর মনে হয় ও আর শশাঙ্ক যেন কাছাকাছি রয়েছে, যোধপুরে ওরা যেমন ছিল।

সমরেশ মজুমদারের ভিজিটের ব্যাপারটা দারুণ মজার বলে মনে হয়েছে শশাঙ্কর। বাসমতী চালের প্যাকেটের সঙ্গে শ্রাবন্তীর প্রিয় পয়মন্ত স্কাই-ব্লু পাইলট পেনের 'বাণিজ্যবিনিময়'-টাও। শিয়াল মামার 'নাকের বদলে নরুণ' প্রাপ্তির মতই উপভোগ্য লেগেছে তার। আরিফ রহমানের আদিস গিয়ে তার বিদায় সভায় "ম্যাডামের" কেঁদে ভাসানোর রটনার কথা পড়ে শশাঙ্কর প্রাণখোলা অট্টহাসি এখানে বসেই যেন স্বকর্ণে শুনতে পেল শ্রাবন্তী। ওর নিজের মনটা অনেক হালকা হল শশাঙ্কর চিঠি পড়ে। অন্যদের চোখে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গিয়ে বোকা বামুনের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে শশাঙ্ক। লিখেছে, "তুমি নিজে যেটা ভাল মনে করবে সেই ভাবে চলবে। তাতে কে কি ভাবলো সে কথা ভেবে সময় নষ্ট করবে কেন? তুমি কি, সেটাই ইম্পর্টেন্ট। লোকের চোখে তোমার কি ভাবমূর্তি ফুটে উঠছে সেটা নগণ্য। হাজারটা মানুষের হাজার রকম দৃষ্টিভঙ্গি। তুমি ক'জনের মন জুগিয়ে চলবে?"

আজ জুরেইশকে বিকেলে আসতে মানা করেছিল শ্রাবন্তী। স্কুলের শেষ দু'টো পিরিয়ডে টার্মিনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রেডী করলো অতো আব্রাহাম, মেনন, হবিবুল্লা ও শ্রাবন্তী চারজনে মিলে। অবশ্য অতো আব্রাহামের অবদান নামমাত্র। ডিপার্টমেন্টের একমাত্র ইথিওপিয়ান টিচার হিসেবে ওকেই হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট করা হয়েছে। ভদ্রলোকের ইংরিজী ভাষার দখল - লিখিত বা কথ্য- দুইই বেশ নড়বড়ে। তবু ওকে সামনে রেখে বাকী টিচাররা ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম দেখে। বেশ সুচারু ভাবেই সব কিছু চলে আসছে এযাবৎ। আরও দু'জন টিচার যারা আছে তারা মহিলা বলে সংসারের কাজকর্মের দোহাই দিয়ে সব রকম বাড়তি কাজ এড়িয়ে চলে। শ্রাবন্তীর ভারী খারাপ লাগে। এ যেন গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। সব ব্যাপারে সমকক্ষতা দাবী করবে আবার সেই সঙ্গে যত রকম বিশেষ সুবিধাও চাই।

প্রশ্নপত্র অফিসে জমা দেবার পর অতো আব্রাহাম সবাইকে ন্যাশনাল বার'এ চা খাওয়ালো। বোধহয় নিজের ঘাটতি পুরিয়ে দেবার প্রয়াসেই। ফেরার পথে শ্রাবন্তী ও অতো আব্রাহাম একই ট্যাক্সিতে এলো। শ্রাবন্তীকে কাবেলের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে আব্রাহাম নিজের নিবাসে চললো পদব্রজে। আরও আধ মাইলখানেক ভিতরের দিকে গিয়ে বাড়ি তার। শেয়ারের ট্যাক্সির ভাড়া অতি অল্প কিন্তু অতো আব্রাহামের পিড়াপিড়িতে শ্রাবন্তী ট্যাক্সির ভাড়াটা ওকেই দিতে দিলো। এটাও হয়তো ইংরিজী ভাষায় অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ। অন্তত সেই হিসেবে ধরলে শ্রাবন্তীর পক্ষে কম আপত্তিজনক। মহিলা বলে তার ট্যাক্সি ভাড়া আরেকজন দেবে সে সব সেকেলেপনা ওর একেবারেই পছন্দ নয়।

বাড়ির সামনের দরজা ও পিছনের দরজা দু'টোই বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে। পিছনের দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকলো শ্রাবন্তী রোজকার মত। সামনের দরজাটা ভিতরের দিক থেকে ছিটকিনি তোলা থাকে। কালেভদ্রে ভিতরের ছিটকিনি ও বাইরের তালা খুলে দরজাটা খুলে রাখে খানিকক্ষণ।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেরী নেই আর। শ্রাবন্তী তড়িঘড়ি বাথরুমটা ঘুরে এলো একবার। তারপর চটপট ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। হঠাৎ কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো তার। অন্যদিন জুরেইশ যাবার আগেই বাথরুম ঘুরে আসে। বারোয়ারী উঠোনের মাঝে সারি দেওয়া মাটির খুদে ঘরগুলো ওর দারুণ অপছন্দ। শুধু এই কারণেই মাঝে মাঝে পশ্ কলোনির বাড়িতে উঠে যাবার কথা মনে হয় তার। কিন্তু অন্য সব সুবিধার কথা ভেবে এযাবৎ এখানেই রয়ে গেছে সে। বাথরুমে গেলেই ওর মনে হয় পাশের ঘরটায় ভীতিজনক কেউ বা কিছু ঘাপটি মেরে রয়েছে। আজ ওর অব্যবহৃত রান্নাঘরের দরজাটায় বেশ খানিকটা ফাঁক আছে বলে মনে হয়েছিল তার। অথচ খানিক পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো টান টান করে বন্ধ রয়েছে দরজাটা। জুরেইশ না থাকলে ওদিকে যেতে বেশ ভয় করে শ্রাবন্তীর, যে জন্যে ভোরবেলা জুরেইশ না আসা অবধি ওমুখো হয় না। নিজের পান-ভোজন সম্পর্কেও ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে ওই কারণেই।

রাত্রি একটু গভীর হলে হায়েনার দল পাহাড়ের ঢল বেয়ে নীচে নেমে আসে। শহরের প্রান্তে একটা শীর্ণ নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কোথায় এর উৎস জানে না শ্রাবন্তী। ভাষা বিভ্রাটের জন্যে অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গেছে। শ্রাবন্তীর বাড়িখানা একেবারে শেষের সারিতে, হায়েনাদের আনাগোনার পথে। শশাঙ্কর

মতে এটা নাকি রক্ষাকবচ। একদল হায়েনা যে পথে যাতায়াত করে দুস্কৃতীরা স্বভাবতই সেই পথ এড়িয়ে চলবে।

একটা বড় রকমের টেনসনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে অথচ ঠিক কি - কেন - কোথায় সে প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। ইথিওপিয়ানরা সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। গত সপ্তাহে হঠাৎ একদিন দেখে স্কুলের বিশাল কম্পাউণ্ড জুড়ে রাতারাতি অনেকগুলো তাঁবু গজিয়েছে ব্যাঙের ছাতার মত। কম্যাণ্ডো সৈনিকরা বেঁটে স্টেনগান হাতে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। তারই মাঝে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছে টিচাররা, স্কুলের টাইম টেবিলের রুটিন ধরে। ছাত্ররা ক্লাসে আসছে, পুরো পিরিয়ড ধৈর্যভরে বসে থাকছে টিচারের মুখপানে চেয়ে। হোমওয়ার্ক - ক্লাসওয়ার্ক কোন কিছুতেই গাফিলতি নেই।

মিসেস মেনন ক'দিন স্কুলে আসেনি। শ্রাবন্তী দেখা করতে গেছিল, অসুখ বিসুখ হয়েছে মনে করে। দেখলো তা নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে খুব ভেঙ্গে পড়েছে ভদ্রমহিলা। ওরা গত আট বছর ধরে আছে এদেশে। সত্তা বদলের সময় আদিসে ছিল, ছুটি কাটাতে গেছিল ক'দিনের জন্যে। হঠাৎ বিপ্লব শুরু হল। পথে ঘাটে মৃতদেহের স্তুপ। রাশি রাশি লাশ পড়ে আছে যত্র তত্র। আবার নরদেহের সঙ্গে বেশ কয়েকটা মরা কুকুরও ফেলে রেখেছে আততায়ীরা, দর্শকদের মনে ভালমত প্রভাব পড়ে যাতে। সেবার সেই সব দৃশ্য দেখে অনুসুইয়া মেনন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেই দিনগুলোর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

শ্রাবন্তীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। দেশ দেখতে এসেছে, গণসংহার দেখতে নয়। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বেরোবার পথ বন্ধ। কন্ট্রাক্টের মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি নিষ্কৃতি নেই।

কাবেলের পাড়াটা কেমন নিঃঝুম হয়ে গেছে। আগে যেদিকেই তাকাতো শ্রাবন্তী ঝলমলে হাসি মুখ চোখে পড়তো তার। এখন পাড়ার লোকগুলো ওকে দেখলেই নিস্পৃহ নিরাসক্ত মুখে চোখ ফিরিয়ে নেয়। গত ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে শ্রাবন্তী কেমন একটা চোরা চাউনি দিয়ে ওকে দেখছে লোকে। কারণটা কিছুতেই ধরতে পারে না। সংশয় উদ্বেগে আকুল হয়। দূর বিদেশে একা পড়ে আছে। তা-ও আবার এমন জায়গায় ঘর পেয়েছে যে দু'টো কথা বলার মত

কেউ নেই। এ্যাদ্দিন তবুও ওদের হাবে ভাবে আন্তরিকতার প্রকাশ ছিল, এখন সেটাও নেই। অচেনা অজানা জগতের কোন চক্রব্যুহে আটকা পড়েছে শ্রাবন্তী। বেরোবার পথ জানা নেই। নানারকম অশুভ চিন্তা, ভয়াবহ কল্পনা মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে সর্বক্ষণ। হাজার চেষ্টা করেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না তাদের। ছেলেবেলায় পড়া দূর বিদেশের বিভীষিকাময় কাহিনী, আজগুবি যত উৎকট ঘটনার কথা মনে পড়ে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে সে।

দুপুর থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল থেকে ফিরে ভিজে কাপড়চোপড় পালটে নিলো শ্রাবন্তী। রোজ এ সময় জুরেইশ ওর জন্যে চা জলখাবার তৈরী করে। আজ জুরেইশের দেখাই নেই মোটে। সকালে এসেছিল। থমথমে মুখে রোজকার কাজগুলো করে চলে গেল। বিকেলে শ্রাবন্তী স্কুল থেকে ফেরার আগেই এসে পড়ে জুরেইশ। দরজার বাইরে অপেক্ষা করে। আজ আবার কি হল কে জানে! পিছন দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল শ্রাবন্তী। বারোয়ারী উঠোনে সারাদিন নানা রকম কাজকর্ম চালু থাকে। সন্ধ্যে হবার আগেই সে সব গুটিয়ে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে।

শ্রাবন্তীর মনে হল ওর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কারা যেন চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। আগে হলে অনায়াসে দরজা খুলে দিতো সে, এক মুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যেতো। আগন্তুক হয়তো কোনও প্রতিবেশিনী। প্লেটে করে ইনজেরা আর ওয়াৎ এনেছে শ্রাবন্তীর জন্যে। আজ আর দরজা খোলার কথা মনে হল না তার। দরজার এ পাশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিক বাদে আগন্তুকের চলে যাওয়ার আভাস পেলো। কিন্তু তবু দরজা খুলে দেখার সাহস হল না। আড়ষ্ট হয়ে একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শোবার ঘরে এসে বিছানার উপর বসে পড়লো।

আজ দশদিন হয়ে গেল শশাঙ্কর কোন চিঠি পায়নি সে। আদিসের রাস্তা নাকি আপাতকালীন স্থিতির জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মিলিটারী কনভয় যেতে পারে শুধু। কতদিন এ ভাবে চলবে কে জানে ----।